পরিবেশ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাস (১৯৪৭-২০১১)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা শাখার ইতিহাস বিভাগের
পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

মৃন্ময় ভারতী

নিবন্ধন সংখ্যা- A00HI1200918

বর্ষ-২০১৮

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক মহুয়া সরকার

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের পরিবেশ ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সামাজিক বাস্তুতন্ত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ট, অবিচ্ছেদ্য এবং দীর্ঘকালের। পরিবেশ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমার গবেষণার বিষয়টি সুন্দরবনের পরিবেশ, অর্থনীতি, সমাজজীবন, বনসম্পদ, জলসম্পদ, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের প্রভাব নিয়ে। উল্লিখিত গবেষণা পত্রটির সময়পর্ব হিসাবে ১৯৪৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করেছি। ১৯৪৭ এবং ২০১১ সালকে গবেষণার জন্য কেন নির্বাচন করলাম তার বেশ কয়েকটি কারণ আছে। ১৯৪৭ সালকে নির্বাচন করেছি কারণ- এই সালে ভারত দীর্ঘ একশো-নব্বই বছরের ঔপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। এই স্বাধীনতা ও দেশ বিভাজন সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের উপরে গভীর আঘাত করেছিল, কারণ এই বিভাজন এতদিনের গড়ে ওঠা সামাজিক বাস্তুতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে দ্বিখণ্ডিত করেছিল। তাই ১৯৪৭ সালের এই যুগসন্ধিক্ষণকে গবেষণাপত্রের শুরুর সাল হিসাবে নির্বাচন করেছি। ২০১১ সালকে নির্বাচনের কারণ হল ১৯৪৭ সালের মত ২০১১ সালেও দীর্ঘ ৩৫ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে। তাই এই রাজনৈতিক কালপর্বটিকে গবেষণার সুবিধার্থে গ্রহণ করেছি। সুন্দরবনের পটভূমিতে এই কালপর্বের একটি নির্দিষ্ট অবয়ব তৈরি হয়েছিল, যা এই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ২০১১ সালের আদমশুমারি আমার গবেষণার সালকে ২০১১ পর্যন্ত নির্বাচন করার গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। দেশভাগ, তেভাগা আন্দোলন, বর্গা আন্দোলন, উদ্বাস্তু সমস্যা ও মরিচঝাঁপি প্রভৃতি

রাজনৈতিক ঘটনাবলী সুন্দরবনের সমাজ ও পরিবেশ ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। নিম্নবর্গের মানুষ ও তাদের অবস্থানের বিষয়টি এই গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু।

সুন্দরবনের অবস্থান

নিম্নবঙ্গীয় অঞ্চলে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদের মোহনায় বঙ্গোপসাগরের খুব কাছে পলি সঞ্চয়ের ফলে এশিয়া তথা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যে দ্বীপ গড়ে উঠেছিল তার নাম সুন্দরবন। আজ থেকে কয়েকশো বছর পূর্বে প্রাচীনকালে সুন্দরবনের যে কি নাম ছিল সেটা অনুমান সাপেক্ষ। নামকরণ নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও বর্তমানে সুন্দরবন নামটি সর্বজনস্বীকৃত। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাজনের আগে সুন্দরবনের অবস্থান সম্পূর্ণ ভাবে ভারতের অধীনস্থ ছিল। তারপর ভারত বিভাজনের সাথে সাথে সুন্দরবনের অবস্থানের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। বর্তমানে সুন্দরবন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিভাজিত। প্রায় ২৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সুন্দরবনের অবস্থান, যার তিন ভাগ বাংলাদেশের অংশ। ভারতীয় সুন্দরবন ৯,৬৩০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে বাদাবন অর্থাৎ শুধুমাত্র ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল - ৪,২৬৪ বর্গ কিলোমিটার। এই বনাঞ্চলের মধ্যে ২৩৪৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকাতে শুধুমাত্র বনভূমি গড়ে উঠেছে এবং বাকি ১৯২০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাতে সুন্দরবনের জলাভূমি। সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্প- ২,৫৮৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে এবং ব্যাঘ্র প্রকল্পের বহির্ভূত অঞ্চল ১৬৮১ বর্গ কিলোমিটার। সুন্দরবনের বন হাসিল করে গড়ে ওঠা লোকালয়, কৃষিজমি ও নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষের ভেড়ীর আয়তন ৫৩৬৩ বর্গ কিলোমিটার। জনবসতিপূর্ণ এলাকা ৪৪৯৩ বর্গ কিলোমিটার। ভারতীয় সুন্দরবনের মানচিত্রের

ভৌগোলিক অবস্থান হল পশ্চিমে হুগলী নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তর-পূর্বে ইছামতী, কালিন্দী, রায়মঙ্গল নদী তথা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সীমানা বরাবর জল-জঙ্গলেপূর্ণ বিশাল ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। ভারতীয় সুন্দরবনের মধ্যে মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২ টি। জনবসতিপূর্ণ দ্বীপ ৫৪ টি এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল ৪৮ টি দ্বীপ এবং অভয়ারণ্য তিনটি (সজনেখালি, লোথিয়ান দ্বীপ ও হ্যালিডে দ্বীপ)।

ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে সুন্দরবন অঞ্চলটি ২১°৩২´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২২°৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫´ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯০°২৮´ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারণ করেছিল ড্যাম্পিয়ার ও হজেস নামক দুই বিখ্যাত ব্রিটিশ জরিপবিদ। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৯ টি ব্লক নিয়ে গড়ে উঠেছিল ভারতীয় সুন্দরবন। উত্তর ২৪ পরগনার ৬ টি ব্লক, সেগুলি হল- হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি-১, সন্দেশখালি-২, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, হাসনাবাদ। এইগুলি সবই জনবসতিপূর্ণ এলাকা, উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যে কোনো গভীর জঙ্গল নেই। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১৩ টি ব্লকের মধ্যে সুন্দরবনের অবস্থান। সেগুলি হল- গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং-১, ক্যানিং-২, জয়নগর-১, জয়নগর-২, মথুরাপুর-১, মথুরাপুর-২, কুলতলি, পাথর প্রতিমা, কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর। সুন্দরবনে মোট তিনটি লোকসভা কেন্দ্র- জয়নগর, মথুরাপুর ও বসিরহাট। মহকুমা- ৫টি, গ্রাম পঞ্চায়েত- ১৯০টি, মৌজা- ১০৮৫টি, গ্রাম- ১০৬৪টি, থানা- ১৭টি, উপকূলীয় থানা- ৩টি, মোট ব্লক- ১৯টি। সুন্দরবনে অনেক নদীর অস্তিত্ব বর্তমান, সেগুলোর মধ্যে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নদী নিম্নরূপ- রায়মঙ্গল, মাতলা, বিদ্যাধরী, ঝিলা, ঠাকুরান, হরিণভাঙা, পঞ্চমুখী, হোগল, সপ্তমুখী, মুড়িগঙ্গা, পিয়ালি, হুগলী, মনী, করতাল, কালিন্দী প্রভৃতি। সুন্দরবনের মোট নদীবাঁধের দৈর্ঘ্য ৩৫০০ কিলোমিটার, যার মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগণাতে-১২০০

কিলোমিটার এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণাতে ২৩০০ কিলোমিটার। ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুসারে সুন্দরবনের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৪২ লক্ষ, যার মধ্যে ৫২ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৮ শতাংশ মহিলা। কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগণের সংখ্যা প্রায় ৮৫ শতাংশ। তপশিলী জাতি ও উপজাতি প্রায় ৪৪ শতাংশ। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও মাদ্রাসা বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৫০০টি, কলেজ ১০টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ২০টি, হাসপাতাল ১০টি। সুন্দরবনবাসীর প্রধান জীবিকা হল- কৃষি এবং উপজীবিকা হল মাছধরা, কাঠ, মধু ও মোম সংগ্রহ ইত্যাদি।[৫] পর্যালোচনা ও গবেষণার জন্য সুন্দরবনকে পাঁচটি মূল উপভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলি হলো- ১. উত্তরে ন্যাজাট- সন্দেশখালি অঞ্চল, ২. উত্তর-পশ্চিমে- ক্যানিং অঞ্চল, ৩. পশ্চিমে- কাকদ্বীপ অঞ্চল, ৪. পূর্বে- গোসাবা অঞ্চল, ৫. দক্ষিণ-পূর্বে- সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ অঞ্চল।

তাত্ত্বিক আলোচনায় সামাজিক বাস্তুতন্ত্র

'সামাজিক বাস্তুতন্ত্র' বলতে ঠিক কি বোঝায় সে বিষয়ে গবেষণার শুরুতে আলোচনা করে নেওয়া আবশ্যক। এককথায় সামাজিক বাস্তুতন্ত্র বলতে আমরা বুঝি বাস্তুতন্ত্রের এক নতুন সংযোজন। আমরা যদি জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তুতন্ত্রকে দেখার চেষ্টা করি তাহলে দেখব একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোনো একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের জীব এবং সেই অঞ্চলের জড় উপাদানের সাথে আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য উৎপন্ন উপাদানের যে বিনিময় ঘটায় তাকে বাস্তুতন্ত্র বলে। বাস্তুতন্ত্র হল একটি সামগ্রিক ক্রিয়া পদ্ধতি, যার দ্বারা যে কোনো স্থান বা অঞ্চলের উদ্ভিদ, প্রাণী, জড় প্রভৃতি সকলের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্কের বন্ধন গড়ে ওঠে। একই ভাবে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রও হল

একটি ব্যবস্থাপনা। সামাজিক বাস্তুতন্ত্র বলতে 'সমাজবদ্ধ সমস্ত কিছুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি অলিখিত ব্যবস্থাপনাকে বোঝানো হয়েছে'। এককথায় সুন্দরবনের সমাজ, মানুষ, জীব, জন্তু, আকাশ, বাতাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়কে একটা ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ রাখাকেই সামাজিক বাস্তুতন্ত্র বলছি। রামচন্দ্র গুহর মতে বাস্তুতন্ত্র সমাজ বিজ্ঞানের যেকোনো শাখায় প্রয়োগ করা যেতে পারে, বিশেষ করে সামাজিকক্ষেত্রে। সমাজের উন্নয়ন, বিবর্তন ও অভিযোজনমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের মাধ্যমে।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সামাজিক ও পরিবেশগত দর্শনের ধারাকে বাস্তবিক দিক থেকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সামাজিক বাস্তুতন্ত্র নামে একটি ভাবাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও বাস্তুতন্ত্র বলতে জীবকূল ও পরিবেশকেই বোঝায়, কিন্তু সামাজিক বাস্তুতন্ত্র হল এমন একটি দর্শন যেখানে মানুষ এবং মানুষের সাথে নিবিড় সম্পর্কিত পরিবেশের কথা উঠে আসে। সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, এই দর্শন আমাদের এই পৃথিবীকে সচেতন করে তুলতে ও তার নিজস্ব প্রতিফলন ঘটিয়ে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের কথা বলে। সামাজিক বাস্তুতন্ত্র হল একটি সুসংগত পরিকাঠামো যা বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশ বিরোধী প্রবণতার তীব্র সমালোচক। সেইসঙ্গে সমাজের কাছে পরিবেশের বাস্তুতান্ত্রিক পরিকাঠামোর পুনর্গঠনের নৈতিক আবেদন জানায়। সুতরাং এককথায় সামাজিক বাস্তুতন্ত্র হল মানবগোষ্ঠী এবং পরিবেশের মধ্যেকার একে অপরের সাথে সম্পর্কিত একটি দর্শন। পরিবেশের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে মানুষের বিশেষত দুর্বল, প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের ভাবনাটিও বোঝাতে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ব্যবহার করা হচ্ছে।

সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের বেশকিছু মৌলিক শ্রেণীবিভাজনের কথা বলেছে। সেগুলি হলো- ১. অর্থনীতি, যার মধ্যে শক্তি ও উৎপাদনের সম্পর্ক, পণ্য পরিষেবা বন্টন ও বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে ২. রাজনীতি বা ক্ষমতার সম্পর্ক, যেখানে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর, প্রতিষ্ঠান, আইন এবং রাষ্ট্রের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে ৩. সামাজিক কাঠামো, যেখানে পরিবার, আত্মীয়তা, জাতি এবং সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে ৪. সংস্কৃতি, যার মধ্যে শিল্পকলা, ধর্ম এবং আদর্শের কথা বলা হয়েছে ৫. জৈবিক কাঠামো, যার মধ্যে মাটি, জল, উদ্ভিদ, প্রাণীকুল ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত অভিব্যক্তিগুলির সম্মিলিত ধারণা ও মতাদর্শ সামাজিক বাস্তুতন্ত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই পরিবেশগত কাঠামোর অবস্থার পরিবর্তনের ফলে একদিকে যেমন মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনের দিক নির্দেশনা পরিচালিত হয়, তেমনভাবে অন্যদিকে মানুষের অংশগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ প্রাকৃতিক পরিবেশকে 'পুনর্বিকৃত' করে তোলে। রামচন্দ্র গুহ তাঁর Social Ecology গ্রন্থে বলেছেন যে, সামাজিক বাস্তুতন্ত্র হল- সচেতনতার ওপর নির্ভর করে পরিবেশগত কাঠামোর সাথে সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যেকার সম্পর্ক স্থাপন।

'A Social Ecology' প্রবন্ধে জন ক্লার্ক দেখিয়েছেন যে, দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সামাজিক বাস্তুতন্ত্র সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে সত্ত্বাতাত্ত্বিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক নৈতিকতা এবং রাজনৈতিক মাত্রার মধ্যে দিয়ে সামাজিক ও বাস্তুতান্ত্রিক একটা সম্পর্ক গড়ে তুলছে, যেটি আমাদের প্রকৃত মানব এবং প্রাকৃতিক ইতিহাসের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নির্ধারণে সাহায্য করে। ফরাসী ভূগোলবিদ এলিসি রেক্লাস (১৮৩০-১৯০৫) একটি সুদূরপ্রসারী সামাজিক ভূগোলবিদ্যার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন, যা সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন

করেছিল, আর এই সামাজিক বাস্তুবিদ্যাই মানব সমাজের সঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির সম্পর্ককে খুঁজে চলেছে। হোমো স্যাপিয়েন্সের উত্থান থেকে শুরু করে নগরায়ণের প্রসার, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন এবং প্রাথমিক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রভৃতি সবকিছুই সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের পরিধির অন্তর্গত। এলিসি রেক্লাস প্রকৃতির সাথে সাদৃশ্য রেখে একটি মুক্ত অসাম্প্রদায়িক মানবিক সমাজের কল্পনা করেছেন।

রেক্লাসের চিন্তাভবনাকে আরও বিস্তৃত করেন স্কটিশ উদ্ভিদবিদ এবং সমাজতাত্ত্বিক প্যাট্রিক গেডেস। তিনি তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে মানব সমাজ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেকার এক প্রগতিশীল আন্তঃসম্পর্কের দার্শনিক বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর কাজকে জীবমণ্ডলের দার্শনিক অধ্যয়ন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। গেডেস পার্শ্ববর্তী সাংস্কৃতিক কাঠামো এবং প্রাকৃতিক পরিবেশগত অঞ্চলের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে একটি বিকেন্দ্রীভূত সম্প্রদায় গঠনের ওপর জোর দেন। এছাড়াও তিনি আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের প্রস্তাব দেন, যা মানবিক ও পরিবেশগত ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় গড়ে তুলতে উৎসাহিত করবে। সুতরাং গেডেস এইভাবে একটি সাংগঠনিক উন্নয়নশীল সমবায় সমিতি গঠনের কথা বলেন। গেডেস তাঁর কাজকে 'Place Work and Folk' মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখেন। এই ভাবে তিনি তাঁর কাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে 'সমাজবিজ্ঞান' নামক সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের একটি উন্নয়নমূলক জৈব-আঞ্চলিক দিকের বিকাশের কথা বলেন।

বর্তমানে সামাজিক-বাস্তুতন্ত্র তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ক্লার্ক যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সংকট এবং অবনতি সম্পর্কে সচেতনতার মধ্যে দিয়ে সামাজিক-বাস্তুতন্ত্র আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তাঁর

ভাষায় “will certainly gain impetus through the awareness of global ecological crisis and deterioration of the community”। তিনি সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী, কারণ তিনি মনে করেন প্রকৃতির কাছে মানবজাতির যে একটা সীমাবদ্ধতা আছে সেটা মেনে নিয়ে একটা সুন্দর প্রাকৃতিক সমাজ গড়ে উঠবে।

সামাজিক বাস্তুতন্ত্রচর্চাকে তত্ত্বগত দিক থেকে আরও জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন মারে বুকচিন। প্রথমদিকে তিনি সমাজ এবং প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে কিছু সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করলেও পরবর্তীকালে রেক্লাস, গেডেস ও মামফোর্ডের সাম্প্রদায়িক, সাংগঠনিক ও আঞ্চলিকতাবাদের ধারণাকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। এককথায় বুকচিন সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ঐতিহ্যকে আরও বিকশিত ও প্রসারিত করেন। তাঁর কাজের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তিনি পরিবেশগত সংকটে উন্নয়নশীল বিশ্ব পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ভূমিকার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন। এর পাশাপাশি তিনি আমাদের সমাজ (যে সমাজে আমরা অংশগ্রহণ করে থাকি) ও সামাজিক দ্বায়বদ্ধতা সম্পর্কেও একটি দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ‘Social Ecology Versus Deep Ecology : A Challenge for the Ecology Movement’ নামক প্রবন্ধে বুকচিন দেখান যে, সামাজিক বাস্তুতন্ত্র হল প্রকৃতিবাদের একটি সুসংহত রূপ যা জীবমণ্ডলের ক্রমাগত বিবর্তনের দিকে আমাদের ইঙ্গিত দেয়। প্রকৃতি থেকে মানুষ ও সমাজকে আলাদা করার অর্থ প্রাকৃতিক বিবর্তনের গুরুত্বকে হ্রাস করা। সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের কাছে প্রকৃতি হল ক্রমাগত প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফসল; যা বাস্তবে অনু ও পরমানু দ্বারা গঠিত। এই অনু এবং পরমাণু আবার অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোটিন, এককোষীতে বিবর্তিত জীব, জেনেটিক কোড, অমেরুদণ্ডী,

মেরুদণ্ডী, উভচর, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী প্রাণী সর্বোপরি মানুষের বিবর্তনে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ এই সবকিছু একটা বৃহতর জটিল বিবর্তনবাদের অংশস্বরূপ এবং পৃথিবীতে জৈব বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসের সর্বশেষতম বিকাশ হল মানুষ। কেবল জীবগত বিবর্তনই নয়, বুকচিন সামাজিক স্তরক্রম এবং আধিপত্য-অধীনতার বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। এখান থেকেই প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ববাদের ধারণার উদ্ভব হয়। তাঁর মতে প্রকৃতির ওপর মানব সমাজের আধিপত্য এবং প্রকৃতির ধ্বংস একঅর্থে সামাজিক বৈষম্য বা স্তরভেদকেই (Social Hierarchy) সুনিশ্চিত করে। এর থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে তিনি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মত নৈতিক নীতিগুলির ওপর জোর দেন। তাই বলা যায় সামাজিক বাস্তুতন্ত্র চর্চা পরিবেশগত অপব্যবহারের প্রতিকার করতে চায়, তথা আধিপত্য বা স্তরভেদের পুরো ব্যবস্থাকেই একটা চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাতে চায়। জীবজগৎ তথা সমগ্র পরিবেশের অখণ্ডতাকে সুনিশ্চিত করতে মানবসমাজকে অবশ্যই সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। সামাজিক বাস্তুতন্ত্র চর্চা আমাদেরকে ক্রমাগত সেই সত্যের কাছাকাছি উপনীত করছে।

সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের দর্শন ও ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে আলোচ্য গবেষণায় সুন্দরবনের প্রেক্ষিতে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ব্যবহারিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সুন্দরবনের অনন্য ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু, বিশেষ করে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের বৈচিত্র্য এখানকার অর্থনীতি, রাজনীতি ও জীবনধারণকে প্রভাবিত করেছে ও সেইসঙ্গে এখানকার মানুষের সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতাদর্শ গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। সুন্দরবনে বসবাসকারী মানুষজন ও অন্যান্য প্রাণীকূল এখানকার কঠোর পরিবেশগত বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং অভিযোজনের দ্বারা নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। এইরূপ গতিশীল পরিবেশে মানুষের জীবন সর্বদা প্রকৃতির দান। বসতি স্থাপনের

জন্য বন পরিষ্কার করা অথবা বনসম্পদের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা সবসময় সুন্দরবনবাসীদের একটা চ্যালেঞ্জের মুখে এনে দাঁড় করায়। তাই সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের সাপেক্ষে একটি ঐতিহাসিক গবেষণা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকতা লাভ করবে। বিশেষ করে স্বাধীনতা-পরবর্তী সুন্দরবনের ইতিহাসে, বিশেষত পরিবেশের নানা বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাহিত্য পর্যালোচনা

সুন্দরবনের বৈচিত্র্যময় বাস্তুতন্ত্র নিয়ে অনেক ধরণের তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে পাওয়া যায়, যেমন- Gazetteers, District Handbooks, Survey Report, Travel Books, Novels ইত্যাদি। এই সমস্ত উপাদানে সুন্দরবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই আমরা সহজেই বলতে পারি যে, সুন্দরবনের বিভিন্ন দিকে নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান গবেষণা হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের সুন্দরবন নিয়েই গবেষণা হয়েছে। তবে অধিকাংশ গবেষণা যে কোনো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আলোচিত হয়েছে। যেমন- রাজনৈতিক পরিকাঠামো, সুন্দরবনের উন্নয়ন সম্ভাবনা, ম্যানগ্রোভ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, মৎস্যজীবীদের অবস্থা, আঞ্চলিক পরিবেশ, বিপর্যয় ইত্যাদি। এই সমস্ত গবেষণার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকলেও একথা বলা যায় যে, স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতীয় সুন্দরবনের ইতিহাসে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের দার্শনিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা গবেষণার অভাব আছে, যা বর্তমান গবেষণাতে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।

এ প্রসঙ্গে সুন্দরবন নিয়ে কিছু মূল্যবান গবেষণার কথা উল্লেখ করতে হবে, যেমন- WW Hunter, তাঁর 'A Statisical Account of Bengal: Districts of the 24 Parganas and Sundarbans' বইতে ১৮৭৫ সালের সুন্দরবনের বিস্তারিত বিবরণ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে লেখেন। মূলত ঔপনিবেশিক পর্বের ইতিহাস হলেও গ্রন্থটি সুন্দরবন সম্পর্কে জানার একটি উল্লেখযোগ্য আধার। পরবর্তীকালে আরও অনেক ব্রিটিশ প্রশাসক ঔপনিবেশিক আমলের সুন্দরবনের বিস্তারিত বিবরণ দেন, ঐতিহাসিক পলগ্রীনো বলেন যে, উনিশ শতকের সুন্দরবন মূলত সমুদ্রের উপর ভাসমান একটি বিপদজনক ব-দ্বীপ। Sutapa Chatterjee Sarkar তাঁর 'The Sundarbans Folk Deities, Monsters and Mortals' বইতে সুন্দরবনের জমি উদ্ধার, কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলন, পোর্ট ক্যানিং ও গোসাবার সমবায়ের উন্নয়ন, ক্রমবর্ধমান নদীর জোয়ার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে খুবই সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। Amit Bhattacharyya and Mahua Sarkar তাঁদের 'History and the Changing Horizon Science, Environment and Social Systems' বইতে অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার দেখিয়েছেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় সুন্দরবন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল। নব্য উদারবাদী পুঁজিবাদের প্রসারতাকে আঁকড়ে ধরার বিরুদ্ধে দেশীয় জ্ঞান সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, কীভাবে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের প্রবণতা পরিবেশগত বিপর্যয় ডেকে এনেছে যা প্রকৃতির সাথে সাথে মানবজাতিকেও প্রভাবিত করছে। Annu Jalais তাঁর 'Forests of Tigers: People, Politics and Environment in the Sundarbans' বইতে সুন্দরবনকে নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। বইটির মূখ্য উপাদান যদিও সুন্দরবনের বাঘ। তাঁর মূল প্রশ্ন হল 'সুন্দরবনের জন্য বাঘ

কতটা গুরুত্বপূর্ণ? বা সুন্দরবনের দ্বীপগুলোর জন্য বাঘ কতটা মহার্ঘ্য। এই প্রশ্নের উত্তর নানা জনগোষ্ঠী নানা ভাবে প্রদান করেছে। তবে বাঘ যে সমগ্র সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের জন্য খুবই মূল্যবান একটি সম্পদ সেটা পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেছেন। Rup Kumar Barman, তাঁর 'Fisheries and Fishermen, A socio-economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial Bengal and Post-Colonial West Bengal' বইতে সুন্দরবনের মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মৎস্যজীবীদের জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি সম্পর্কেও বিশ্লেষণ করেছেন। রঞ্জন চক্রবর্তী এবং ইন্দ্র কুমার মিস্ত্রী তাঁদের 'সুন্দরবনের অর্থনীতি, জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ' বইটিতে সুন্দরবনের আঞ্চলিক অর্থনীতি, সুন্দরবনের পরিবেশ, সুন্দরবনের ব্রিটিশ শাসন ও তাদের বাঘ শিকার, সুন্দরবনবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনের একটি রূপরেখা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল সম্পাদিত 'দ্বীপভূমি সুন্দরবন' বইতে সুন্দরবনের সমগ্র দিকগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সুন্দরবনের ইতিহাস, রাজনীতি, কৃষি ব্যবস্থা, অর্থনীতি, নারীর ক্ষমতায়ন, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুই আলোচনা করেছেন বইটির মধ্যে। উপরিউক্ত আলোচ্য গবেষণাধর্মী বইগুলো আমার গবেষণাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছে এবং গবেষণাকে সঠিক দিশা দেখাতে সাহায্য করেছে।

গবেষণা সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী

আলোচ্য গবেষণার মাধ্যমে বেশকিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি, কারণ সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্র বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি এই প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হয়েছি। **প্রথমত,** স্বাধীনতার পরে সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের অবস্থা কেমন ছিল।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা পরবর্তী সুন্দরবনের উদ্বাস্তু সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধানে সরকারী পদক্ষেপ কেমন ছিল? **তৃতীয়ত**, সরকারী পরিকল্পনার মাধ্যমে সুন্দরবনের বনসম্পদ সত্যিই কি রক্ষা পেয়েছে? সেই প্রেক্ষিতে পরিবেশ আন্দোলনের কী ভূমিকা? **চতুর্থত**, বনসম্পদে ভরপুর সুন্দরবন কীভাবে স্থানীয় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করে? **পঞ্চমত**, কীভাবে বেসরকারি প্রকল্পগুলি সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে? এই প্রেক্ষিতে এই অঞ্চলের পশ্চাৎপদ মেয়েদের কী অবদান? **ষষ্ঠত**, সাহিত্য ও অন্যান্য প্রাথমিক উপাদানের মাধ্যমে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্র বিশেষত নদীকেন্দ্রিক জীবন সম্পর্কে কি সন্ধান পাওয়া যায়? আমার গবেষণায় এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

অধ্যায় বিভাজন

গবেষণার সুবিধার্থে আলোচ্য গবেষণাপত্রটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাজিত করে বিশ্লেষণ করেছি, যা সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে তুলে ধরেছি। প্রথম অধ্যায়, **'স্বাধীনতা পরবর্তী সুন্দরবনের অবস্থা ও উন্নয়নের প্রগতিশীলতা',** এই অধ্যায়ে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাজনের ফলে কেমন ভাবে সামাজিক বাস্তুতান্ত্রিক পরিকাঠামোর বিভাজন ঘটেছে সেটা দেখানোর সাথে সাথে তৎকালীন সৃষ্টি হওয়া সমস্যাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কেমন ভাবে উদ্বাস্তু মানুষের আর্তনাদ তৎকালীন পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল সেটা বিশ্লেষণ করেছি। নবনির্বাচিত সরকারের কাছে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণে সরকার কি কি গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল সেটা দেখিয়েছি। এছাড়া এই সময় হয়ে চলা সুন্দরবনের বিভিন্ন আন্দোলন, যেমন তেভাগা

আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জমিদারী উচ্ছেদ, বর্গা আইন একটি যুগান্তকারী ঘটনা ছিল। সুন্দরবনের উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসাবে ১৯৭৩ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গঠন সরকারের সবথেকে বড় সাফল্য ছিল। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সূচনার পর থেকে সুন্দরবনের উন্নয়ন খুবই দ্রুত গতিতে হতে শুরু করেছিল। যেমন- ১৯৭৩ সালেই ২৫৮৫ বর্গ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছিল ব্যাঘ্র প্রকল্প। ১৯৭৬ সালে পাথরপ্রতিমা থানার অন্তর্গত ভগবতপুর মৌজায় সপ্তমুখি নদীর ধারে কুমীর প্রকল্প গড়ে উঠেছিল। ওই বছরই আরও তিনটি ঘটনা ঘটেছিল - সজনেখালীতে ৩৬২ বর্গ কিলোমিটার, লেথিয়ান দ্বীপে ৩৮ বর্গ কিলোমিটার, হ্যালিডে দ্বীপে ৬ বর্গ কিলোমিটার এবং মাতলা নদীর পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলের ৫৫৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে ব্যাঘ্র প্রকল্পের কোর এলাকার ১৩৩০ বর্গ কিলোমিটার জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। ১৯৮৭ সালের ১১ ডিসেম্বর সুন্দরবনের সম্মানে নতুন পালকের সংযোগ হয়েছিল অর্থাৎ ওই দিনে আন্তর্জাতিক সংস্থা UNESCO সুন্দরবনের জাতীয় উদ্যানকে বিশ্বের ঐতিহ্যশালী স্থান (World Heritage Site) হিসাবে ঘোষণা করেছিল। ১৯৮৯ সালে ২৯শে মার্চ সমগ্র সুন্দরবনকে অর্থাৎ ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে সুন্দরবন জীব পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৯৪ সালে সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর গঠিত হওয়ার পর সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ আরও সুগঠিত হয়েছিল। এই ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সুন্দরবনের ইতিহাসে প্রগতিশীলতা তৈরি করেছিল।

গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করেছি '**ঐতিহ্যের রক্ষাকল্পে সুন্দরবনের বনসম্পদ ও সামাজিক বাস্তুতন্ত্র**'। এই অধ্যায়ে দেখিয়েছি সুন্দরবনের ঐতিহ্যের রক্ষাকল্পে

বনসম্পদ ও সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা কিরূপ। সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বা অমূল্য সম্পদ হল বনসম্পদ। অরণ্যে বসবাস করা মানুষ যখন পাথরে পাথরে ঘষে আগুনের ব্যবহার শিখেছিল, মানব সভ্যতার সেই ঊষালগ্ন থেকে বনসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম হয়ে দেখা দিয়েছিল। সুন্দরবনের ইতিহাসে সুন্দরবনের বনসম্পদের অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত। এই অঞ্চলের সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের অঙ্গ, বিশেষ করে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের পরিবেশগত গুরুত্ব, যার ব্যাপ্তি আঞ্চলিক স্তরের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। বন সম্পদের দুটি দিকের গুরুত্ব সবথেকে বেশি উল্লেখযোগ্য ক) অর্থনৈতিক গুরুত্ব খ) পরিবেশগত গুরুত্ব। বনসম্পদের গুরুত্ব ছাড়াও আলোচ্য অধ্যায়ে বন আইন ও পরিবেশ আন্দোলন সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বনের এই গুরুত্ব বনসম্পদের কারণে এবং এই বনসম্পদের সঠিক সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্যই বনআইন তৈরি করা হয়েছিল। বনসম্পদের সংরক্ষণের জন্য সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য, কিন্তু সর্বদা এই সহযোগিতা পাওয়া যায় না, তখন আইন প্রণয়নের দ্বারা বনসম্পদের রক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প থাকে না। তাই বনসম্পদের রক্ষার জন্য সৃষ্ট আইনকেই আমরা বনআইন বলছি। অন্যদিকে পরিবেশের রক্ষার জন্য সংগঠিত আন্দোলনকে আমরা পরিবেশ আন্দোলন নামে আখ্যায়িত করেছি। সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাস এবং পরিবেশ ভাবনা ও চর্চাতে পরিবেশ আন্দোলনের উল্লেখ করাটা একান্ত কাম্য। পরিবেশ আন্দোলন সম্পর্কে সবার আগে সকলের মনে একটা প্রশ্নের জন্ম হয় যে, এই পরিবেশ আন্দোলন কার বিরুদ্ধে? কারও মতে এই আন্দোলন সমগ্র মানব সমাজের বিরুদ্ধে মানব সমাজেরই আন্দোলন। আবার

কারও মতে পরিবেশ দূষণের শিকার সবাই হলেও দায়ী বর্তমান সমাজব্যবস্থা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার যারা কর্ণধার সেই শাসক ও বড় ব্যবসায়ী শ্রেণী, তাই এই আন্দোলন তাদের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই আমাদের পরিবেশ আন্দোলন সংগঠিত হওয়ায় বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য অধ্যায়ে তেমনই কয়েকটি পরিবেশ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করছি। সুন্দরবনের পরিবেশ আন্দোলনের মধ্যে লক্ষ্মীকান্তপুরের ডোলা রোড গ্রামের রাসায়নিক সার প্রস্তুতকারী সংস্থার বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও আলোচ্য অধ্যায়ে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বিপর্যয় থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে স্থানীয় পদক্ষেপ সম্পর্কেও আলোচনা করেছি।

গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করেছি **'সুন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা ও কার্যকলাপ'**। এই অধ্যায়ে সুন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা ও কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করেছি। সুন্দরবনের সামগ্রিক গ্রাম উন্নয়নে সরকারি অবদান অনস্বীকার্য। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথ ভাবে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সাথে যুক্ত। সুন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকার ছাড়াও আরও অনেক সংস্থা, গোষ্ঠী ও সংগঠন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ওই সমস্ত সংস্থা বা গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা ও কার্যকলাপ সুন্দরবনের অগ্রগতিতে কতটা গতি প্রদান করেছে সেটাই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। আলোচ্য অধ্যায়ে আমি সুন্দরবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সংস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, এই সংস্থাগুলো সুন্দরবনের সর্বস্তরের উন্নয়নে কেমন ভাবে কাজ করছে। সংস্থা দুটি হল- ক) টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট খ) জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র।

গবেষণাপত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের নামকরণ করেছি **'বাংলা সাহিত্যের আলোকে সুন্দরবনের নদী ও জলসম্পদ'**। এই অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যের আলোকে সুন্দরবনের নদী ও জলসম্পদের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সুন্দরবনের ধারণাকে বাঙালি চেতনায় নতুন মাত্রা প্রদান করেছে। আধুনিক সাহিত্যে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে সুন্দরবনবাসীর আঞ্চলিক জীবনের সামাজিক আখ্যান। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি ধারাতে সুন্দরবনকেন্দ্রিক সমাজ জীবনের বার্তা বহন করতে দেখা গেছে। বেশিরভাগ গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও গানের মধ্যে সুন্দরবনের প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যেকার বন্ধনকে তুলে ধরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং সুন্দরবনবাসীর সমাজ জীবনকে চিত্রিত করা হয়েছে। সুন্দরবনের প্রতি ভালোবাসা, জীবিকার জন্য সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীলতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আড়ালে বিপদসঙ্কুল সংগ্রামী জীবন প্রভৃতি ধরা পড়েছে সাহিত্যের মধ্যে। সুন্দরবনের সাহিত্যে নদীকে সবথেকে বেশী গুরুত্ব প্রদান করে হয়েছে। সাহিত্যিক আলোচনা ছাড়াও আলোচ্য অধ্যায়ে সুন্দরবনের নদীসম্পদের বিষয়ে আলোচনা করেছি। সুন্দরবনের নদী কীভাবে সুন্দরবনবাসীর জীবনকে আনন্দময় করে তুলছে সে বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছি।

গবেষণাপত্রের পঞ্চম অধ্যায়ের নামকরণ করেছি **'সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের আলোকে সুন্দরবনের নারী'**। এই অধ্যায়ে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের আলোকে সুন্দরবনের নারী, অর্থাৎ সুন্দরবনের নারীদের জীবন সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেছি। নারী ও পুরুষ সকলের অবদান সমান সমান। নারীকে বাদ দিয়ে যে কোনো সভ্যতার মানোন্নয়নের কথা কল্পনা করা সম্ভব নয়। অথচ এই নারীরাই সমাজে অবহেলার পাত্রে পরিণত হয়ে আছে। সুন্দরবনের ক্রমাগত সাফল্য ও উন্নয়নের পেছনে সুন্দরবনের নারীদের অবদান

অনস্বীকার্য। নারীদের স্বনির্ভরতা ছাড়া কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। তাই আমার আলোচ্য অধ্যায়ের বিচার্য বিষয় হল সুন্দরবনের নারীদের জীবন সংগ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধা এবং সেই বাধা সত্ত্বেও কিভাবে তারা সুন্দরবনের ইতিহাসে তাদের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে এবং সুন্দরবনের উন্নয়নে কিভাবে নিজেদের অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে সেটার বিশ্লেষণ করা। সেই প্রসঙ্গে রাঙ্গাবেলিয়া ও জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশকেন্দ্র নারীদের উন্নয়নে ও স্বনির্ভর করার জন্য যেসমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেটা আলোচনা করেছি। সেইসঙ্গে অসহায় বিধবা, দরিদ্র মহিলাদের সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জীবন সংগ্রাম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কঠোর প্রতিকূলতার সামনেও হার না মানা মানসিকতাকে বাঁচিয়ে রেখে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার আরেক নাম সুন্দরবনের নারী সমাজ। এই সমস্ত বিষয়কে নিয়ে আলোচ্য অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছি।

গবেষণা পদ্ধতি

আমার আলোচ্য গবেষণার কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে প্রথম পর্বে সুন্দরবনকেন্দ্রিক বই পড়ে নিজের ধারণাটিকে স্পষ্ট করে তুলেছি। এই সমস্ত বইগুলো সংগ্রহ করার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার, ক্যানিং বসন্ত সেন গ্রন্থাগার, লিটল ম্যাগাজিন গ্রন্থাগার, গোসাবা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়য়ের ইতিহাস বিভাগের গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়য়ের বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগার, আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা মহুয়া সরকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থাগারের বই ব্যবহার করেছি। এছাড়া এই গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মূখ্য উপাদান

পাওয়ার জন্য সুন্দরবন সম্পর্কিত বিভিন্ন দপ্তর পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করেছি। যেমন- বন দপ্তরের প্রতিবেদন, অরণ্য দপ্তরের প্রতিবেদন, পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিবেদন, রাজ্য মহাফেজখানা ও ভারতীয় পরিসংখ্যানসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান থেকে আদমশুমারির প্রতিবেদন, সেচ দপ্তরের প্রতিবেদন, রাঙ্গাবেলিয়া ও জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের তথ্য ও বাৎসরিক প্রতিবেদন, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য, সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের প্রতিবেদন প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে আমার গবেষণার কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। এছাড়া সুন্দরবনের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং মৎস্যজীবী, মধু সংগ্রহকারী, কাঠ সংগ্রহকারী, সরকারি আধিকারিক প্রভৃতি ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমার গবেষণার কাজটিকে অনেকটা সহজ করে দিয়েছে। সুন্দরবনের মত প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষদের বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে জানার জন্য উপাদান হিসাবে বই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, মুখের কথায় ইতিহাস ইত্যাদির সাহায্য নিতে হয়েছে। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, সুন্দরবনের ইতিহাস এমনকি বর্তমানের ইতিহাস বিষয়ে উপাদানের একান্ত অভাব। এই বাধা পেরিয়ে গবেষণার তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি।